

করোনার সাথে সহাবস্থান

পৃথিবীতে ১৬৫ খ্রিঃ থেকে ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন মহামারীর নিষ্ঠুর আক্রমণে বিশ্বব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে প্রায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় আবার বিশ্ব ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে প্লেগ, কলেরা, এইডস ও স্মলপক্স-এ সর্বাধিক মৃত্যু সংঘটিত হয়। ১৬৫-১৮০ খ্রিঃ তে অ্যান্টোনাইন প্লেগ এ ৫০ লাখ, ৫৪১-৫৪২ খ্রিঃ তে জাস্টিনিয়ানের প্লেগ-এ ৩-৫ কোটি, ১৩৪৭-১৩৫১ খ্রিঃ তে ব্ল্যাক ডেথ (বাবোনিক প্লেগ) এ ২০ কোটি (ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী), ১৫২০ খ্রিঃ তে স্মল পক্স এ ৫.৬ কোটি, ১৮৫৫ খ্রিঃ এ তৃতীয় প্লেগ এ ১.২ কোটি, ১৯১৮-১৯১৯ এ স্প্যানিশ ফ্লুতে ৪-৫ কোটি, ১৯৮১ সাল থেকে অদ্যাবধি ২.৫-৩.৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আর ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ এ ৩,৭৩,১৭৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং মোট আক্রান্ত ৬১,৭২,৩০২ জন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন ২৭,৪৩,৬০৬ জন। বর্তমানে করোনা (কোভিড-১৯) নিয়ে বিশ্বব্যাপী মহাআতঙ্ক শুরু হয়েছে। প্রযুক্তির শীর্ষে থাকা দেশসমূহও এ ভাইরাসে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। প্রায় সব দেশের অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। তবুও এটা নিশ্চিত যে মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়াবে। আবার বিশ্ব কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে; যার ওয়ার্মআপ শুরু হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আপেক্ষিকালীন ব্যবস্থা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল রায়ান বলেছেন, “এই প্রথম বার সম্পূর্ণ নতুন ও অজানা একটি ভাইরাস মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে। তাই এর থেকে এখনই যে রেহাই পাব তা নয়, আবার কবে আমরা এই ভাইরাসকে পরাস্ত করতে পারব; তা অনুমান করাও কঠিন।” শুধু তাই নয় রায়ানের মতে, এই ভাইরাস আমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে একটি স্থানীয় ভাইরাসে পরিণত হবে। তার শক্তি ক্ষয় হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে শেষ করে ফেলা যাবে না। হু এর বিশেষজ্ঞ রায়ান এইচআইভি (এইডস) এর সঙ্গে এর তুলনা করে বলেছেন এইচআইভিকে নির্মূল করা যায়নি, তেমনি কোভিড-১৯ কেও শেষ করে ফেলা যাবে না। তবে তার মতে কার্যকর প্রতিষেধক এসে গেলে এই ভাইরাসের উল্লম্ফন বা ক্ষমতাও অনেক খর্ব হবে। তবে কোনোও ভাবেই একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।

ভারতীয় ভাইরোলজিস্ট ও গবেষক (চিকিৎসক) সমীর কে ব্রহ্মচারীর মতে, কোভিড-১৯ এতই শক্তিশালী ভাইরাস যে একজন সংক্রমিত এক মাসে চারহাজার জনকে সংক্রমিত করতে পারেন। তাঁর মতে, কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগোষ্ঠীতে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা বা দলীয় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা (Herd Immunity) গড়ে তোলা প্রয়োজন। কোনো দেশের প্রায় ৯০% মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনই Herd Immunity বা দলগত অনাক্রম্যতা। কিন্তু এতে ঝুঁকি বেশি। কারণ হার্ড ইমিউনিটির ফলে অর্জিত ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এ্যান্টিবডি মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়াও সম্ভব নয় এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। সুতরাং কার্যকর ভ্যাকসিন ও ঔষধ আবিষ্কারই কোভিড-১৯ থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল ‘নেচার’ এর সাম্প্রতিক সংখ্যা হতে জানা যায় যে, এই মুহূর্তে বিশ্বে মোট ৭৮টি টিকা নিয়ে হিউম্যান ট্রায়াল শুরুর পথে। আরো ৩৭টি টিকা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ৭৮টি Confirmed টিকা- এর ৭৩টি Preclinical পর্যায়ে আছে। তন্মধ্যে mRNA-1273 (Moderna), Ad5-nCov (Cansino Biologicals), INO-4800 (Inovio), LV-SMENP-DC and Pathogen-specific aAPC (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute)। বিভিন্ন বহুজাতিক বৃহৎ কোম্পানি Sanofi, Pfizer, GlaxoSmithkline (gsk) কোভিড-১৯ এর টিকা গবেষণা ও প্রস্তুতে ব্যাপক

কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। এছাড়া MIT, Oxford, Cambridge প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সম্পর্কিত গবেষণা ও পরীক্ষায় ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছে। চীনা গবেষকরাও তিনটি টিকা নিয়ে ফেজ-ওয়ান ট্রায়াল শুরু করেছে। তবে কোন টিকাই আগামী ২০২১ সালের আগে বাজারে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীগণ। কারণ তাঁদের মতে, টিকা বাজারজাতকরণের আগে নানা দফায় প্রচুর মানুষের উপর তার হিউম্যান ট্রায়াল করা প্রয়োজন। যত বেশি মানুষের উপর ট্রায়াল চালানো যায় ততই মজাল। কোন প্রতিষেধক বা টিকা ব্যবহার উপযোগী করার পূর্বে প্রথমে অ্যানিমেল মডেল বা পশুদেহের উপর (বিশেষ করে বানর) তা প্রয়োগ করা হয়। তা সফল হলে প্রথমে কয়েকজন সুস্থ মানুষের উপর তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। একে বলা হয় ‘ফেজ-ওয়ান ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’। যদি তা সফল হয় তখন ‘ফেজ-টু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’ কয়েকটি গোষ্ঠীর উপরে সেই প্রতিষেধক বা টিকা প্রয়োগ করা হয়। এই ধাপ সফল হলে আরো বেশি সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উপর তা প্রয়োগ করা হয়- যাকে বলে ‘ফেজ-থ্রি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল’। সুতরাং কোভিড-১৯ এর টিকা আমাদের পর্যায়ে আসতে যে এখনও অনেক সময়ের প্রয়োজন তা সহজে অনুমেয়।

তাহলে বাঁচার উপায় কী? দীর্ঘমেয়াদী ‘লক ডাউন’-এ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রত্যেকের আয়ে নীতিবাচক প্রভাব পড়ায় আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। মোটা দাগে বলা যায় কয়েকমাস ধরে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ (SARS-COV-2) এর সংক্রমণে থমকে আছে বিশ্ব। অন্যদিকে এ ভাইরাসকে আটকানোর জন্য বিশ্বব্যাপী নিরন্তর গবেষণা চলছে।

আমেরিকার জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ও মেডিসিন ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক ডঃ জেরেমি গ্রিন বলেন, ‘মানুষ যখন জিজ্ঞেস করে কবে নাগাদ মহামারী শেষ হবে, তখন আসলে তারা সামাজিকভাবে সেটি শেষ হওয়ার কথা জানতে চায়’। সহজ ভাষায় একটা রোগ একদম নিশ্চিহ্ন হলে তবেই এর প্রকোপ বন্ধ হয় এমন নয়। বরং মানুষ একসময় এই ভীতিকর অবস্থার সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং রোগের সাথে বেঁচে থাকতে শিখে যায়। ঠিক এমনই কিছু হতে যাচ্ছে কোভিড-১৯ এর বেলায়। হার্ভার্ড এর ইতিহাসবিদ অ্যালান ব্রান্ড বলেন, ‘অর্থনীতি অনেক দিন ধরেই স্তিমিত হয়ে আছে। সব খাতেই এর গুরুতর প্রভাব পড়েছে। তবু যখন এই অর্থনীতির চাকা সচল করার কথা বলা হয় তখন প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাত থেকে মহামারী সমাপ্তির ঘোষণা আসার আগেই অর্থনীতিকে সচল করার চাপ বাড়ছে। সামাজিক উদ্বেগ বাড়ছে। রাজনৈতিকভাবেও চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তবু কিছু হয়তো করার নেই। অতীতেও এমন ঘটেছিল। ধীরে ধীরে সব নতুন করে শুরু হবে’।

আসলেই ‘জীবন ও জীবিকা’ এর সমন্বয়ের মাধ্যমে এখনই নতুন করে শুরু করতে হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের নির্দেশনা মেনে নিজের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে, এজন্য কিছুটা ঝুঁকিও নিতে হবে। কারণ মানুষ কখনোই শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকি বিশেষজ্ঞ এবং পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক স্যার ডেভিড স্পিজেলহন্টার এর মতে, ‘পুরো বিষয়টি আসলে “ঝুঁকি ব্যবস্থার” বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই যে পরিমাণ ঝুঁকি আমরা মোকাবেলা করি তার উপর একটি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে’। সুতরাং নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিয়ে সরকারী নির্দেশনা মেনে আমাদের সীমিত পরিসরে স্বাভাবিক কাজ শুরু করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বেশি থেকে বেশি কাজের মাত্রা বাড়াতে হবে।

এমতাবস্থায় কার্যকর টিকা বা ঔষধ আসার আগে নিজের সুরক্ষা নিজে গ্রহণ এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবেঃ

- (১) “রোগ ঠেকানোর ৮০ শতাংশ চাবিকাঠি আছে হাত ধোয়ার মধ্যে”- কাজেই দিনে কমপক্ষে ৬ বার WHO নির্দেশিত পদ্ধতিতে হাত পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া জীবাণু থাকার আশংকা আছে এমন জায়গায় স্পর্শ করলে সেনিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে। হাত ধোয়ার জন্য সাধারণ সাবানই যথেষ্ট। টাকা ধরার পর হাত পরিষ্কার করতে হবে। তবে অবশ্যই (Running Water) পড়ন্ত/ চলন্ত ব্যবহার করতে হবে।
- (২) রাস্তায় বের হলে মাস্ক বাধ্যতামূলক, অফিসেও পড়তে হবে। এছাড়া সবসময় পকেটে বুমাল, টিস্যু পেপার, হ্যান্ড সেনিটাইজার ও ছোট সাবান রাখতে হবে।
- (৩) মাস্ক পরার পরও মানুষের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। নিরাপদ ৬ ফুট হলে ভালো, সম্ভব না হলে কমপক্ষে ৩ ফুট।
- (৪) সবসময় চশমা পড়তে হবে। যারা চশমা পড়ে না তাদের রোদ চশমা পড়তে হবে।
- (৫) বড় চুল থেকেও বিপদ হতে পারে। তাই চুল ছোট রাখা এবং তা সম্ভব না হলে স্কার্ফ বা কাপড়ে বেঁধে রাখা।
- (৬) নিয়মিত ধোঁয়া যায় এমন জুতা ব্যবহার করা উত্তম, নচেৎ জুতা বাহিরে রাখা অথবা ক্লিচিং পাউডার-এ জুতার তোলা পরিষ্কার করা।
- (৭) ঘড়ি ও অলংকার/ গয়না আপাততঃ ব্যবহার না করা।
- (৮) বাসা থেকে অফিসে খাবার নিয়ে যাওয়া ভালো। তা সম্ভব না হলে পাকেটজাত বাদাম, বিস্কুট ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। খোসা ছাড়িয়ে খেতে হয় এমন ফল যেমন আম, কমলা, মোসাম্বি, আনার ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।
- (৯) নিয়মিত ব্যায়াম করা ও গায়ে হালকা রোদ (২০ মিনিট) লাগানো ভালো।
- (১০) বাহির/ অফিস থেকে বাসায় ফিরে পরনের সব কাপড় এয়ার টাইট ব্যাগে ভরে রাখবেন; অথবা ধুয়ে নিলে ভালো। এরপর তাড়াতাড়ি বাথরুমে যেয়ে সাবান/ শ্যাম্পু দিয়ে ভালভাবে গোসল করবেন। বাথরুমেই চশমা, মোবাইল, বেল্ট ইত্যাদি গোসলের পূর্বেই স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- (১১) অন্ততঃ এক বছর বিদেশ ভ্রমণ না করা।
- (১২) আপাততঃ বাইরের খাবার পরিহার করা।
- (১৩) বিয়ে বা অন্যান্য জনবহুল অনুষ্ঠানে না যাওয়া।
- (১৪) অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ বন্ধ রাখা।

- (১৫) কমপক্ষে এক বছর কোনো সমাবেশ বা ভিড়ের জায়গায় না যাওয়া।
- (১৬) সম্ভব হলে সব ধরনের যোগাযোগ মেইল বা ফোনে সেরে ফেলুন।
- (১৭) লিফট পরিহার করে সিঁড়ি ব্যবহার করুন।
- (১৮) লেবু পানি, গ্রিন-টি মশলা চা পান করা ভালো। এছাড়া ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরী।
- (১৯) সেলুন ও বিউটি পার্লার ব্যবহারে অতি সতর্কতা অবলম্বন করা।
- (২০) শিষ্টাচার মেনে হাঁচি ও কাশি দেওয়া।
- (২১) যার যার চারপাশ জীবাণুমুক্ত রাখা।
- (২২) অসাবধানতাবশতঃ সন্দেহজনক কোনো করোনা রোগীর কাছে/ সংস্পর্শে এলে অতিসত্বর ভালো করে গোসল করা উচিত।
- (২৩) বইপড়া, ব্যায়াম ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- (২৪) সামাজিক দূরত্বের বিধি-বিধান গুরুত্বের সাথে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- (২৫) কারো সঙ্গে হাত মেলানো বা আলিঙ্গন করা থেকে বিরত থাকুন।

গুনশচ (বিবিসি বাংলা থেকে সংকলিত ও সংক্ষেপিত) :

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের একটি গবেষণা ও তদন্ত থেকে জানা যায় যে, দেহে ভাইরাস আছে, কিন্তু উপসর্গ নেই- এমন রোগীরা নীরবে কোভিড-১৯ ছড়াচ্ছেন- যা অত্যন্ত আতঙ্কের। সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান ভারনন লী এর মতে এরকম উপসর্গ-বিহীন নীরব বিস্তারকারীর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ জানুয়ারী সিঙ্গাপুরের দা লাইফ চার্জ এ্যান্ড মিশন নামের গির্জার রোববারের প্রার্থনায় উপস্থিতদের সাথে ছিলেন একজন উপসর্গবিহীন চীনা স্পোর্টস ডম্পতি- যারা সেদিনই চীনের উহান থেকে এসেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সিঙ্গাপুরে করোনার বিস্তার শুরু হয়- কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞ- এর উৎস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ভারনন লী এ ব্যাপারে বলেন, “আমরা একেবারেই বোকা বনে গিয়েছিলাম; যাদের দেহে রোগের কোন লক্ষণ নেই, তারা কী করে অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে?”। কোভিড-১৯ সম্পর্কে তখন তাঁদের যেটুকু জানা ছিল- সেই জ্ঞান দিয়ে তাঁরা বুঝতেই পারছিলেন না যে কী করে লোকের মধ্যে রোগটা ছড়াচ্ছে। ডঃ লী তখন পুলিশ এবং রোগ সংক্রমণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা তদন্ত শুরু করলেন; কে কখন কবে কোথায় ছিলেন তার একটা মানচিত্র তৈরি করলেন। যাকে কন্টাক্ট ট্রেসিং বলা হয়- যার মাধ্যমে কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছে তা জানা যায় এবং রোগ বিস্তার ঠেকানো যায়। বলা হয় সিঙ্গাপুরের তদন্তকারীরা এ কাজে বিশেষ দক্ষ। কয়েকদিনের মধ্যে তার সেই গির্জার ১৯১ জন লোকের সাথে কথা বললেন এবং বের করলেন যে তাদের মধ্যে ১৪২ জন সেই রোববারের প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন। এটাও বেরিয়ে এলো তার মধ্যে যে দু’জন সংক্রমিত হয়েছিলেন- তারা সেই চীনা দম্পতির সাথে একই প্রার্থনায় ছিলেন।

ডঃ ভারনন লী- এর মতে, “হয়তো তারা চীনা দম্পতির সাথে কথা বলছিলেন, বা পরস্পরকে সম্ভাষণ করছিলেন- যা গির্জায় প্রার্থনার সময় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা”। এ থেকে একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছিল। কিন্তু যে প্রশ্নের জবাব মিলছে না তা হলোঃ “সেই চীনা দম্পতির দেহে তো সংক্রমণের কোনো লক্ষণ ছিল না। তাহলে তারা কিভাবে ভাইরাস ছড়ালেন?” তার ওপর আরো কঠিন একটি প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। সেটা হচ্ছে, সিঙ্গাপুরের যে ৫২ বছর বয়স্ক মহিলা তৃতীয় সংক্রমিত ব্যক্তি ছিলেন- তিনি সেই প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ওই গির্জাতেই সেদিন অন্য সময়ে একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহলে কীভাবে সংক্রমিত হলেন? অপ্রত্যাশিত তথ্য প্রমাণ মিললো সিসিটিভিতে, সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে তদন্তকারীরা গির্জার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তা থেকেই বেরিয়ে এলো এক অপ্রত্যাশিত তথ্য। চীনা দম্পতি গির্জা থেকে চলে যাবার পর তারা যে চেয়ারে বসেছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পর সেই চেয়ারেই এসে বসেছিলেন আক্রান্ত মহিলাটি। বোঝা গেল, চীনা দম্পতিটির হয়তো নিজেদের কোনো অসুস্থতা ছিল বা কোন উপসর্গ ছিল না- কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা না জেনেই করোনাভাইরাস ছড়িয়ে অন্যদের সংক্রমিত করেছেন। হয়তো তাদের হাতে ভাইরাস লেগে ছিল, বা হয়তো তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে এটি ছড়িয়েছে। ঠিক কি ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়- কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল বিশাল। এটা এমন এক তথ্য যা জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর আগে বলা হচ্ছিল করোনাভাইরাস ঠেকাতে হলে নিজের বা অন্যদের কোন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে কিনা তার দিকে নজর রাখতে হবে। কিন্তু এখন জানা গেল- কোন উপসর্গ না থাকলেও নীরবে এবং অদৃশ্যভাবে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। সুতরাং সকলকে আতঙ্কিত না হয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং সর্বদা SMS অনুসরণ করতে হবে;

S= Sanitize Yourself

M=Mask Wearing

S=Social Distancing

তথ্য সূত্রঃ

- (i) www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
- (ii) Nature Magazine
- (iii) আনন্দবাজার পত্রিকা (ভারত)
- (iv) সংবাদ প্রতিদিন (ভারত)
- (v) বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকা
- (vi) বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্পর্কিত webaddress
- (vii) বিবিসি বাংলা

(মোঃ রেজাউল ইসলাম প্রধান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

গবেষণা ও উন্নয়ন (অঃ দাঃ)